প্রথম আলো

কলাম

মতামত

টেকসই শিক্ষা ও সামাজিক ব্যবসা

লেখা: মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

প্রকাশ: ০৯ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ০৪

বিশ্ব সামাজিক ব্যবসা সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস (বাঁয়ে)। মঞ্চে বসে আছেন মেক্সিকোর অর্থমন্ত্রী ইলদেফনসো গুয়াহার্দো ভিয়াররেয়াল। *ছবি: নাসির আলী মামুন*

শিক্ষা খাতের সূচনা হয়েছিল মানবসেবার অঙ্গীকার থেকে—একটি দক্ষ ও উৎপাদনশীল কর্মশক্তি গড়ে তোলা এবং জীবনের পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে। শিক্ষা তরুণ মানসকে গঠন ও পরিশীলিত করে। এটি সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করে, ব্যক্তিকে সমাজে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে গড়ে তুলে। এভাবেই একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজের ভিত্তি তৈরি হয়।

অনেক দেশ শিক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে জ্ঞানের প্রসার ও প্রযুক্তিতে অগ্রগামী হয়েছে এবং ক্রমাগত নতুন পণ্য ও উদ্ভাবন বাজারে আনছে। প্রতিযোগ্যতা ও উদ্ভাবনের এ ক্ষেত্র এখন হয়ে উঠেছে একটি লাভজনক ব্যবসা। স্কুল, অনলাইন কোর্স, প্রাইভেট টিউশন, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ভাষাশিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও শিক্ষাসংক্রান্ত পণ্য—টাকার ছড়াছড়ি সবকিছুতেই।

বাংলাদেশে শিক্ষার অবিরাম চাহিদার কারণে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বেড়ে উঠেছে। সরকার যখন এ চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছে, তখন বেসরকারি খাত এগিয়ে এসে মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছে। উন্নত অবকাঠামো, পর্যাপ্ত সম্পদ ও প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের আরও বেশি উপকারে আসতে পারত।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, উদ্ভাবন, বৈচিত্র্য কিংবা বিশেষ চাহিদার দিকে নজর না দিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো ও শিক্ষার মানোন্নয়নের বদলে কেবল ছাত্র ভর্তি আর আয় বৃদ্ধিতেই মনোযোগী হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে, যা সামাজিক বৈষম্যকে আরও তীব্র করে তুলবে। অন্যদিকে পুরোনো ও সময়োপযোগী নয় এমন পাঠক্রম প্রকৃত শিক্ষা ও শেখার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। শিক্ষাকে কেউ সেবামূলক আবার কেউ ব্যবসা হিসেবে বিবেচনা করে।

তবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিলে বেসরকারি খাত লাভের সঙ্গে জনসেবায়ও ব্রতী হবে। এতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলা যাবে। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করাকে উদ্দেশ্য হিসেবে বলেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িক মানসিকতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রবেশ করেছে। আর অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মূলধনের স্ফীতি ঘটাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে বসছে।

শিক্ষার প্রভাব ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়। খয়রাতি ধারা স্বল্প মেয়াদে কিছু সমাধান দিতে পারে, কিন্তু দানের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত করে এবং উদ্ভাবনকে রদ করে। এর বদলে সামাজিক উদ্যোগ ও সামাজিক ব্যবসা একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং টেকসই পথ। সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম আমাদের তরুণদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে পারে। যখন ব্যবসার মূল্যবোধ সমাজের ভিত্তিকে প্রভাবিত করে, তখন ব্যবসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।

পুঁজিবাদ বৈশ্বিক বাণিজ্যকে চালিত করে সমাজকে কিছু উপকার দিলেও এর সুফল সবার কাছে পৌঁছায়নি। সামাজিক ব্যবসা দরিদ্রতা দূর করে (সম্পদে প্রবেশাধিকার, কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে) এবং সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধান করে (যেমন টেকসয়িতা অর্জন)। এটি মূলত পুনর্বিনিয়োগ ও সামাজিক প্রভাবের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রচলিত মুনাফাভিত্তিক ধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে (যেমন অন্তর্ভুক্তি, ক্ষমতায়ন)।

সাধারণ ব্যবসা বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে অনেককে সমৃদ্ধ করলেও এখনো দারিদ্র্যঘটিত সামাজিক সমস্যাগুলো পুরোপুরি দূর করতে পারেনি। 'ক্রিয়েটিং আ ওয়ার্ল্ড উইদাউট পভার্টি' বইয়ে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস সামাজিক ব্যবসাকে এমন একটি ধারা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা সামাজিক বা পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে কাজ করে।

এ ব্যবসাগুলোর লক্ষ্য মুনাফা বাড়ানো নয়, তবে লোকসানও নয়; বরং ব্যয়াতিরিক্ত অর্থকে এক বা একাধিক সামাজিক উদ্দেশ্যে পুনর্বিনিয়োগ করা, যেমন সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা, স্বল্পায়ীদের জন্য আবাসন, বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ বা নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার। এ পুনর্বিনিয়োগের অগ্রাধিকার পাবে স্বাস্থ্য, আবাসন, পুষ্টি, শিক্ষা বা পরিবেশের মতো খাতগুলো। একটি কল্যাণমুখী প্রেরণা এ বিনিয়োগগুলো নির্ধারিত করে এবং মানুষের ও পরিবেশের ওপর তার প্রভাবই হয় সাফল্যের মানদণ্ড। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মাঝামাঝি দাঁড়ান সামাজিক ধারাটি মূলত পণ্য ও সেবা বিকিয়ে চলে এবং অনুদানের ওপর নির্ভর করে না। ব্যবসা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এমন সহাবস্থান পুঁজিবাদকে একটি বৃহত্তর, মহৎ ও তৃপ্তিদায়ক উদ্দেশ্য দেয়।

শিক্ষা কি একটি সামাজিক ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? যত বেশি শিক্ষা একজন ব্যক্তি অর্জন করেন, তত বেশি তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখার সুযোগ পান। যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকদের বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম।

সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা রয়েছে। কিছু ব্যবসা মুনাফা করলেও এর মালিকানা থাকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হাতে, যারা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়, যেমন বস্তিবাসী একত্র হয়ে খাওয়ার পানির সংস্থান করা। ড্যানোন দই প্রকল্প, গ্রামীণ চক্ষু হাসপাতাল, বিএএসএফের মশারির প্রকল্প কিংবা কোলাইভের যুদ্ধোত্তর অঞ্চলে কাঁচামাল খোঁজা—এসব উদ্যোগ সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগণের অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক।

এ ধরনের প্রকল্প সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ ও পরিবেশগত লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের জীবনের মানোন্নয়নে এবং পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে তুলতে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। মৌলিকভাবে সামাজিক ব্যবসা একটি টেকসই সমাজ গঠনের উপায়, যা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বাধাগুলোর মোকাবিলা করে।

যদিও সামাজিক উদ্যোগ ও সামাজিক ব্যবসা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, তবে সামাজিক ব্যবসা হলো এক রকমের উদ্যোগ। একটি সামাজিক উদ্যোগ বিভিন্ন উৎস থেকে অনুদান নিতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা তা পারেন না। উদাহরণস্বরূপ, জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্র মানুষকে উন্মুক্ত বাজারে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।

শিক্ষা কি একটি সামাজিক ব্যবসা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? যত বেশি শিক্ষা একজন ব্যক্তি অর্জন করেন, তত বেশি তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে অবদান রাখার সুযোগ পান। যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকদের বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম।

শিক্ষা মানুষকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে, প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে। শিক্ষিত উদ্যোক্তারা কর্মসংস্থান তৈরি করেন এবং উৎপাদনের বৈচিত্র্য আনেন, যা একটি সহনশীল ও অভিযোজ্য অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলে। কর্মসংস্থানের সুযোগ যত বাড়বে, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণও তত বাড়বে। ফলে উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধি পাবে। ইউনেসকোর মতে, শিক্ষায় প্রতিটি ডলার বিনিয়োগে বাজারে ১০ থেকে ১৫ ডলারের সমপরিমাণ পুঁজি তৈরি হয় এবং এটি উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে।

শিক্ষা মানুষকে চাহিদা ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রস্তুত করে, উন্নয়নের রথ চালাতে শেখায় এবং একটি গতিশীল সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

একটি শিক্ষিত সমাজ নৈতিক ব্যবসার চর্চা করে, সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করে, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেয়, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকে এবং একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়। শিক্ষা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় এবং দায়িত্বশীল আচরণ ও পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলে, যা বাংলাদেশের জলবায়ু-সংবেদনশীল জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করে।

শিক্ষিত সমাজে মানুষ সাধারণত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সচেতন থাকেন, স্বাস্থ্যকর চর্চা করেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে বেশি অংশ নেন। শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃস্বাস্থ্য, গর্ভকালীন পরিচর্যা, টিকাদান, পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্যবিধি—এসবই শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষিত মানুষ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাকে ভালোভাবে বোঝেন, তাঁদের দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কম থাকে এবং তাঁরা গড়ে বেশি দিন বেঁচে থাকেন।

সামাজিক স্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অসমতা দূর করা জরুরি। ইউনেসকো জানায়, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার দ্বিগুণ হলে সংঘাতের ঝুঁকি অর্ধেকে নেমে আসে। শিক্ষা নাগরিক অংশগ্রহণ, সহানুভূতি ও প্রান্তিকদের প্রতি সংহতির বোধ জাগিয়ে তোলে।

ফলে সমাজে বিশ্বাস, ঐক্য, সম্প্রীতি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয়। শিক্ষা মানুষকে তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে এবং সমাজের সঙ্গে আত্তীকরণে অনুপ্রাণিত করে। নৈতিকতার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়গুলো অপরাধপ্রবণতা কমাতে সাহায্য করে—প্রতি অতিরিক্ত এক বছর শিক্ষা ১১ শতাংশ পর্যন্ত গ্রেপ্তার কমাতে পারে।

এ ছাড়া শিক্ষা নারী নির্যাতন হ্রাস করে, বাল্যবিবাহ কমায় ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসে সহায়তা করে। শিক্ষা সহনশীলতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সর্বজনীন শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলে, যা একটি সংহত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিশীল সমাজ গঠনে সহায়ক। বাংলাদেশের মতো সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিভাজিত একটি দেশে শিক্ষা

পারস্পরিক ব্যবধান কমাতে পারে এবং সংলাপ ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করে, যা সংঘাত নিরসনে সহায়ক। শিক্ষিত মানুষ নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক হুমকি মোকাবিলা করতে এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্য থেকেও বাংলাদেশ একটি উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। এটা সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে। শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মোপলব্ধিতে সক্ষম হন এবং আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শিক্ষিত নারীরা তাঁদের পেশা, সম্পর্ক কিংবা আত্মোন্নয়নের বিষয়ে সচেতনতা দেখাতে সক্ষম এবং জীবনের জটিলতা মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকেন। শিক্ষা ব্যক্তি ও অর্থনীতির জন্য সুযোগ তৈরির একটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে থেকে যাবে।

বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম, কিছু আফ্রিকান দেশের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। যেসব দেশ শিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে, সেসব দেশ দ্রুত সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে। চতুর্থ বিপ্লব পেরিয়ে বিশ্ব যেদিকে ধাবিত হচ্ছে, তাতে প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধির ব্যবহার বাড়ছেই। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় অংশ তরুণ।

তাই শিক্ষায় বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আশার আলো জ্বালাতে পারে। এ ধরনের শিক্ষার যে বিপুল ব্যয়ভার তার জোগানের ব্যাপারেও বাংলাদেশকে ভাবতে হবে। দুঃখজনকভাবে ‘শিক্ষা মানেই উন্নয়ন ও অগ্রগতি’—এ কথা প্রায়ই বাজেটে প্রতিফলিত হয় না। শিক্ষায় বিনিয়োগকে জাতীয় উন্নয়ন, নাগরিক ক্ষমতায়ন, টিকে থাকার লড়াই, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত করা উচিত।

শিক্ষা যেন জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতির আলোচনার অংশ হয়। কফি আনান একবার বলেছিলেন, ‘এডুকেশন ইজ, কুয়াইট সিম্পলি, পিস-বিল্ডিং বাই অ্যানাদার নেম’। শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক খাত হিসেবে উন্নয়ন আলোচনার অংশ হবে।

একে সামাজিক ব্যবসা হিসেবে ধরে নিলেই শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, যা একটি চৌকস সমাজ ও ভবিষ্যৎ গঠনে সহায়ক হবে। সেই লক্ষ্যে সরকারকে বেসরকারি শিক্ষা খাতের বিভিন্ন উদ্যোগকে সহায়তা করতে হবে, যাতে তারা জ্ঞান সৃষ্টি ও বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষার্থীর বেতনের ওপর নির্ভর করাতে গবেষণা, বৃত্তি, আবাসন, পরিবহন ইত্যাদির খরচ মিটাতে পারছে না। বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ‘এন্ডাওমেন্ট ফান্ড’ গড়ে তোলে, যেখানে দাতারা কর অব্যাহতি পান। বাংলাদেশে এমন উদ্যোগ প্রায় নাই-ই।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়ে যে উচ্চ হারে ভ্যাট বসানো হয়েছে, সেটি তারা ‘সামাজিক কল্যাণে অবদান রাখবে’ বিবেচনায় ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ অর্থ শিক্ষণ-শিখনপ্রক্রিয়া, গবেষণা ও উদ্ভাবন উন্নত করতে ব্যবহার করা হলে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সংকটে ভুগছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এ

প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুনাফাখোর না ভেবে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়ার সূতিকাগার হিসেবে গুনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাড়তি আয় তো আইনানুযায়ী শিক্ষা খাতের উন্নয়নেই ব্যবহার করার কথা। আর শিক্ষা যদি ব্যবসাই হয়, তবে একে সামাজিক ব্যবসা হিসেবেই দেখা উচিত।

- **মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান** সহ-উপাচার্য, আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো